আমাদের শান্তিনিকেতন

জহর সরকার

রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো শান্তিনিকেতনকে বিশ্বের একটি সেরা ঐতিহ্যের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তার পর থেকে প্রচুর আলোচনা ও জল্পনা শুরু হয়েছে। ইতিহাস বা সংস্কৃতি নিয়ে উৎসাহ যত বাড়ে ততই মঙ্গল। কিন্তু স্বাভাবিক প্রশ্ন: এই বিশ্ব সম্মানটি ঠিক কী আর তা বলতে কী বোঝায়?

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে মিশরের নীল নদীর উত্তরাঞ্চলের পাথরের মন্দির ও ভাস্কর্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে চেষ্টা শুরু হয়। এর ঠিক পরেই আর একটি বৃহৎ বহুজাতীয় প্রকল্প ভেনিসের বিপন্ন ঐতিহ্যকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। এই দুই দৃষ্টান্তের সাফল্য দেখে ১৯৭২-এ রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রস্তাব গ্রহণ করে ১৯৭৫-এ বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মেলন শুরু করে। স্থির হয়, সারা বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চমানের ও অসামান্য ঐতিহ্যকে রক্ষা করা হবে। কোন কোন স্থানকে নির্ধারিত করা হবে, তা স্থির করবে এক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কমিটি। তাঁরা ওই তালিকায় কোনও ঐতিহাসিক স্থানের প্রস্তাব গ্রহণ করার সময় কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শন পরীক্ষা করবেন কঠিন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে। অতএব পুরো প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল ও কষ্টকর। প্রথমে যে বারোটি সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক স্থান আর প্রাকৃতিক অঞ্চল তালিকাভুক্ত হল তার মধ্যে ভারতের একটিও স্থান পায়নি। শুরুর দিকে এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় পশ্চিমি দেশগুলি পর পর বেশ কয়েকটি স্থান ঢোকাতে সফল হয়।

১৯৮৩ থেকে এই চিত্র বদলাতে শুরু করল। কোনও রাষ্ট্র বছরে দু'টির বেশি ঐতিহাসিক স্থানের প্রস্তাব দিতে পারে না— এখনকার সেই নিয়ম সে সময়ে ছিল না। সে বছর ভারতের চারটি ঐতিহাসিক স্থান স্বীকৃতি পেয়েছিল: তাজমহল, অজন্তা, ইলোরা আর আগরা ফোর্ট। এত দিন পর বিশ্বের ঐতিহ্যের আসরে ভারত স্থান পেল। পরের বছর কোনার্কের সূর্য মন্দির আর তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরম এই সম্মান পেল। ১৯৮৫-তে ভারত তিনটি প্রাকৃতিক অঞ্চলকে প্রথম বার এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হল। দু'টি জাতীয় উদ্যান— কাজিরাঙা ও কেওলাদেও এবং মানস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে এই সম্মানে ইউনেস্কো ভূষিত করল। এর পর থেকেই ভারত খানিক সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করল।

যদিও আমরা তিনটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের কথা বলেছি, আর পরে আমাদের ও বাংলাদেশের সুন্দরবনও এই সম্মানে ভূষিত হয়েছে— আজকের আলোচনা আমরা শুধুমাত্র বিশ্ব-স্বীকৃত ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক স্থানেই সীমিত রাখব। এ প্রসঙ্গে না বলে পারছি না যে কালিম্পঙের নেওরা উপত্যকার প্রাকৃতিক শ্রেণির বিশ্ব সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এই মুহূর্তে আমাদের ইউনেস্কো স্বীকৃত সাতটি প্রাকৃতিক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আর একটি 'মিশ্র' অঞ্চলও আছে।

বিশ্ব জুড়ে ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র আছে ৯১৩টি, যার মধ্যে ভারতে মাত্র ৩৪টি। পার্বত্য রেলের জন্যে একটি উপশ্রেণি আছে। এতে দার্জিলিঙের টয় ট্রেন, শিমলা ও নীলগিরির রেল স্থান পেয়েছে। ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হিসাবে কুতব মিনার, লাল কেল্লা, খাজুরাহো, এলিফ্যান্টা গুহা, মহাবোধি ও চোল আমলের মন্দির, রাজস্থানে পার্বত্য দুর্গ, জয়পুরের যন্তর মন্তর, গোয়ার গির্জা, সবই আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বমানের সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক স্থানই বা কোথায়? আশ্চর্য লাগে ভাবতে শান্তিনিকেতন এই সম্মান পাওয়ার আগে এ রাজ্যে একটি ঐতিহাসিক স্থানও নথিভুক্ত হয়নি। একটি কারণ হল, দেশভাগের পর অবিভক্ত বাংলার প্রাচীন ইসলামপূর্ব ধার্মিক আর ঐতিহাসিক সৌধগুলি বেশির ভাগ চলে গেল পূর্বে—

পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড় মহাবিহার, রাজশাহীর জগদ্দল ও হলুদ বিহার আর কুমিল্লার লালমাই ময়নাবতীর বৌদ্ধ স্থাপত্য। ইসলামীয় স্থাপত্যও বাংলাদেশে বেশি।

এ পার বাংলার সবচেয়ে বৃহৎ ঐতিহাসিক অঞ্চল— গৌড় পাণ্ডুয়া, এতই বিস্তীর্ণ আর ছড়ানো যে একটি প্রস্তাবের মধ্যে এনে সামঞ্জস্য রাখা যথেষ্ট কষ্টদায়ক আর দক্ষতার দরকার। সম্ভবত এই কারণের জন্য এএসআই (পুরাতত্ত্ব বিভাগ) এই প্রস্তাবটি আজ অবধি ইউনেস্কোর সামনে পেশই করেনি। বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও শিল্পকলা এ রাজ্যের আর একটি অমূল্য সম্পদ। ভারত সরকার ১৯৯৮ সালে এই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রস্তাব বিশ্ব সংস্থাকে জমা দিয়েছিল আর ওই সংস্থা প্রচুর প্রশ্ন আর মন্তব্য দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। তার পর থেকে এই অবস্থার কোনও উন্নতি বা সুরাহা হয়নি। ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরে যে-হেতু দু'টির বেশি দিতে পারে না, তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষিও আছে। সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের দিকে না চেয়ে, কোনও কোনও রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে এক থেকে তিন কোটি টাকা খরচ করে নিজেদের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রস্তাব তৈরি করে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে। প্রায় দশ-বারো বছর আগে কেন্দ্রের সংস্কৃতি সচিব থাকাকালীন আমি এ কথাটিও তৎকালীন রাজ্য সরকারকে বলেছিলাম। এ ছাড়া বিশ্বের সম্মানযোগ্য স্থান খুব একটা বেশি নেই। হাজারদুয়ারি প্রাসাদ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো ঔপনিবেশিক অট্টালিকা নিয়ে খুব একটা দূর এগোনো যাবে না। পশ্চিমি সভ্যতা এদের অদ্বিতীয় বা অনুপম বলে স্বীকার করবে না।

শান্তিনিকেতন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে গণ্য হোক, এ স্বপ্ন বহু বছরের, দাবিও অনেক পুরনো। আবার অনেকে ভাবতেই পারেননি মাত্র বারো-তেরো দশক আগের সৃষ্টি শান্তিনিকেতন এত বড় ঐতিহাসিক মর্যাদা পেতে পারে। এই টানাপড়েনের মধ্যে চলে এল রবীন্দ্রসার্ধশতবর্ষ। ২০০৯-এ যখন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সংস্কৃতি মন্ত্রকের দায়িত্ব নিজের কাছে রাখলেন, বেশ কিছু কাজ এগোতে শুরু করল। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্যে দু'টি জাতীয় স্তরের কমিটি স্থাপন করা হল, দু'টিরই সভাপতি প্রধানমন্ত্রী আর কার্যনির্বাহী সভাপতি হলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। অনেক বড় পরিকল্পনার মধ্যে একটি হল শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মানের জন্য প্রস্তাব তৈরি করে পেশ করা। গৌতম সেনগুপ্ত তখন এএসআই-এর মহানির্দেশক। কাজটি তিনি আরম্ভ করলেন। হাতে সময় কম থাকায় আমরা বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি আর একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে বোলপুরে হাজির হলাম। পরিদর্শন ও আলোচনার পর উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য প্রশাসন ও সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া হল। ইতিমধ্যে ভারত সরকার সব দিক দেখে মুম্বইয়ের সংরক্ষণ স্থাপত্যবিদ আভা নারায়ণ লম্বাহকে কাগজ, ছবি, ভিডিয়ো আর প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রস্তাব একত্র করতে দিল। আভা এর আগেও ইউনেস্কোর সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাই ওদের দাবি ও পদ্ধতিও জানেন। কিন্তু তিনি বাংলা না জানায় তাঁকে সাহায্য করার জন্য কলকাতার বিশেষজ্ঞ মণীশ চক্রবর্তী সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁদের প্রস্তাব অনুযায়ী শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতনকে যৌথ ভাবে এক বিশাল রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসাবে তুলে ধরা হল।

তখনই সামনে এল একটি বড় সমস্যা। এই বিশাল হেরিটেজ এলাকা কোন প্রশাসনের দায়িত্বে? এর মধ্যে বিশ্বভারতী ছাড়াও বোলপুর পুরসভা, কিছু পঞ্চায়েত, শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকার— সকলেই জড়িয়ে আছেন। ইউনেস্কোর সাফ প্রশ্ন কাকে তারা দায়িত্বশীল পক্ষ হিসাবে বিবেচনা করবে। উত্তর মেলে না। কেউ অন্য কাউকে অভিভাবক হিসাবে মানতে নারাজ। প্রস্তাবটি ঝুলিয়ে রাখা হল। বছর তিনেক আগে গৌতম সেনগুপ্ত যখন বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা করতেন, আমরা দু'জনেই বর্তমান উপাচার্যকে এই প্রস্তাবটির ব্যাপারে মনে করালাম। মুখ্যমন্ত্রীরও আগ্রহ ছিল। কয়েক মাস আগে জানা গেল, সংস্কৃতি মন্ত্রক বোলপুরের এতগুলি প্রশাসনিক দফতরের ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে ইউনেস্কোকে

জানিয়েছে যে শুধু শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক অঞ্চলের জন্যে বিশ্বমান পেলেই তারা খুশি। এটি গ্রহণ করার ফলে শান্তিনিকেতন বলে বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চলটি খুবই সীমিত হয়ে গেল ও শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও তার অসামান্য কলা-বৈশিষ্ট্য সবই বাদ পড়ে গেল।

তা সত্ত্বেও এই আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি পাওয়া রাজ্যের কাছে সত্যিই গর্বের কারণ। বিশ্ববিদ্যালয় আর বোলপুর শহরের মধ্যে বেশ কয়েক মাস ধরে যে বিবাদ চলছে তার অবসানের সময় এসেছে। পর্যটন বাড়লেই এলাকায় আয় আর কর্মসংস্থান বাড়ে। আর সমস্যাও বাড়ে। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ গৌরব পাওয়া মাত্রই ইউনেস্কোর কঠিন শর্তাবলি মানা— কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে সারা পৃথিবী তা জানতে পারবে। আর এত শর্ত মানা কোনও ব্যক্তি বা একক সংস্থার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সকলে মিলেই এই দায়িত্বটি গ্রহণ করতে হবে।